"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর হয়ে যাবে। অন্তিম সময়কালে যেমনটি ভাববে - সেই লক্ষ্যেই পৌঁছোবে তুমি"

***প্রশ্নঃ -** বাবা বাচ্চাদেরকে কেন এমন উপদেশ দেন যে, চলতে-ফিরতেও স্মরণের যোগে থাকতে হবে ?*

***উত্তরঃ -** (১) এই স্মরণের যোগেই যে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা দূর হয়। (২) স্মরণের যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। (৩) এখন থেকে স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকার অভ্যাসে অভ্যাসী হলে অন্তিমে কেবল এক ও একমাত্র বাবা-ই স্মরণে থাকবে। এ'কথা প্রচলিত আছে - অন্তিম সময়ে যে নারীকে (কামুক বৃত্তি থাকে) স্মরণ করে, পরজন্ম তদনুরূপ হবে। (৪) বাবাকে স্মরণ করলে আগামী ২১-জন্মের সুখ-শান্তি পাকা । বাবার মতন এমন মিষ্ট দুনিয়াতে আর কেহ নাই - কিছু নাই, তাই বাবার নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়। বাচ্চারা, চলতে-ফিরতে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো।"*

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে বসে আছো ? তোমাদের এই সম্বন্ধ হলো প্রিয়তমের চাইতেও প্রিয় যিনি তাঁর স্মরণে- যিনি সবাইকে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাচ্চাদের প্রতি বাবার দৃষ্টি পড়লেই সব পাপ কেটে যায় এবং আত্মা তখন সতোপ্রধানের দিশায় এগোতে থাকে। এই জগৎটা তো দুঃখের সাগর। তাই তো বাবার প্রতি লোকেরা এভাবে বলে- "দুঃখহর্তা-সুখকর্তা"! সত্যিই বাবা এখন এসেছেন, তোমাদের সবরকম দুঃখ-কষ্ট মুক্ত করতে। স্বর্গ-রাজ্যে দুঃখ-কষ্টের নামগন্ধও থাকে না। তাই তো এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত, যাতে বাচ্চাদের প্রতি বাবারও স্নেহ-ভালোবাসা থাকে। তোমরাও তা বুঝতে পারো, কোন্ ধরনের বাচ্চাদের প্রতি বাবার কেমন স্নেহ-ভালোবাসা থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, নিজেদেরকে কেবল আত্মাই ভাববে, শরীর ভাববে না কিন্তু। বাবার রত্ন-বাচ্চা চলতে-ফিরতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। আচ্ছা, এ'কথা কেন বলেন বাবা ? এই কারণেই, যেহেতু তোমাদের ঘাড়ে যে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমা হয়ে আছে। একমাত্র এই স্মরণের যোগের দ্বারাই তোমরা পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে পারো। তোমরা তো জানো, তোমাদের এই শরীর এখন অতি পুরনো হয়েছে, আত্মাই কিন্তু যত দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে। শরীরে যখন আঘাত লাগে, আত্মাতেই সেই আঘাত অনুভূত হয়। আত্মাই বলে আমি রুগী, আমি দুঃখী। এটা যে দুঃখের দুনিয়া। যেখানেই যাও কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সুখধামে দুঃখের নামগন্ধও থাকে না। আর দুঃখের নাম নিলে তখন তোমার স্থান তো দুঃখধামেই হবে। সুখধামে যে বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকে না। এখন সময়ও যে খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে আর। তাই এই সময়ের মধ্যেই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ সম্পূর্ণ করতে হবে। যত বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে, ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। পুরুষার্থ করে এমন অবস্থায় পৌঁছতে হবে যে, অন্তিমে এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। গীতেও তা আছে - অন্তিমকালে যে নারীকে স্মরণ করে (কামের অধীন থাকে) পরজন্মে পতিতা হয়ে থাকে জন্মাতে হয়....! তোমাদের যেমন এখন অন্তিম সময়, এই পুরানো দুনিয়া দুঃখধামেরও তেমনি অন্তিমকাল। এখন যে পুরুষার্থ করছো তোমরা, তা সুখধামে পৌঁছবার লক্ষ্যে। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো এখন, একথা স্মরণে রাখবে অবশ্যই। শূদ্র অর্থাৎ দুঃখের জীবন। এখন তোমরা সেই দুঃখের জীবন থেকে বেরিয়ে আবার শিখরের উচ্চে চড়তে শুরু করেছো। এই কারণেই এই একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। একমাত্র তিনিই যে তোমাদের 'মোস্ট বিলাভড়' বাবা, অর্থাৎ প্রিয়তমের থেকেও অতি প্রিয়। ওঁনার থেকে মিষ্ট আর কি বা আছে জগতে ? আত্মা সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। পরমাত্মাই সকল আত্মাদের পিতা এই বাবা। ওঁনার থেকে মিষ্ট দুনিয়াতে আর কিছুই হয় না।

এবার বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে অনেকেই আছো, কিন্তু সেকেণ্ডেই কাদের সেই স্মরণের যোগ লাগে ? আচ্ছা, সৃষ্টিচক্রকে কিভাবে ঘুড়িয়ে স্মরণ করো তোমরা ? চক্রের প্রকৃত অর্থ তোমাদের তো জানাই আছে। যেমন - তোমরা কোনও নাটক দেখে আসার পর, কেউ যদি জানতে চায়, তোমাদের কি সেই নাটকের পুরো অংশটাই মনে আছে ? সেক্ষেত্রে যদি হ্যাঁ বলো, তবে তো পুরোটাই অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই তা মনে আছে। কিন্তু তার বর্ণনা করতে গেলে সময় তো অনেক লাগবে। তোমাদের এই বাবা যিনি অসীম জগতের বাবা, ওঁনাকে স্মরণ করলেই আগামী ২১-জন্মের সুখ-শান্তি পেয়ে যাও তোমরা। যেহেতু একমাত্র এই বাবার থেকেই সেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। মুহূর্তেই বাবার থেকে সেই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা তোমাদের সামনে চলে আসে। মুহূর্তেই বাবার সেই আশীর্বাদী-বর্সা এসে হাজির হয় তোমাদের সামনে। যেমন, লৌকিকে বাচ্চার জন্ম হলেই বাবা ভেবে নেন আমার

উত্তরাধিকার জন্ম নিয়েছে। সাথে তার বিষয়-আশয়ও স্মরণে আসে। তোমরা বাচ্চারাও তেমনি পৃথক পৃথক সত্ত্বার বাচ্চারা পৃথক পৃথক উত্তরাধিকার পাও। যেমন তোমরা স্মরণের যোগও করো পৃথক পৃথক ভাবে, যদিও তোমরা সবাই একই বাবার ওয়ারিশনের উত্তরাধিকারী। সত্যযুগে তোমাদের একটি করে পুত্র-সন্তান হয়। ফলে সে একাই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশন হয়। বাবা যেমন বাচ্চাদেরকে পায় - বাচ্চারাও তেমনি সেকেন্ডেই বিশ্বের মালিকানা পায়। এতে দেরী হয় না মোটেই। তাই তো বাবা বলতে থাকেন, নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা ভাবো। কিন্তু ফীমেল ভাববে না মোটেই। যেহেতু আত্মা হলো পুরুষাকার। এবার বাবা বলছেন- সব বাচ্চাই তো আমার স্মৃতিতে আসে। প্রকৃত অর্থে আত্মারা সবাই ভাই ভাই। আবার পরে অন্য ধর্মের যারা আসে, তারাও বলে, সব ধর্মাবলম্বীরাই একে অপরের ভাই-ভাই সম্পর্কের। যদিও এই ভাই-ভাইয়ের যথার্থ অর্থ তারা জানে না। তোমরা এখন বুঝতে পারছো, একমাত্র বি.কে.-রাই বাবার মোস্ট বিলাভড় (অতি প্রিয়) বাচ্চা। অতএব বারার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পুরোপুরিটাই অবশ্যই একমাত্র বি.কে.-রাই পাবে। কিন্তু তা পায় কিভাবে ? তাও তোমাদের স্মরণে মুহূর্তেই চলে আসে যে, একদা তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, সেই পর্যায় থেকে এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়েছো। অতএব এবার আবারও সতোপ্রধান হতেই হবে, তবেই তো বাবার কাছ থেকে তোমরা সুখের স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হবে।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা অনুভব করো। দেহ তো বিনাশী। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে আবার নতুন করে অন্য শরীরের গর্ভে প্রবেশ করে। এরপর যখন ছোট্ট পুতুলাকার ভ্রূণ তৈরি হয়, আত্মা তাতে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই আত্মাতে থাকে রাবণের প্রভাব। বিকারে প্রভাবিত হওয়ার কারণে তা হয় গর্ভ-জেল। আর স্বর্গ-রাজ্যে রাবণের উপস্থিতি না থাকার কারণে, সেখানে এমন কোনও দুঃখ-কষ্টের ব্যাপার থাকে না। সেখানে যখন তোমরা বুড়ো হও, তখন অনুভব করো-এবার আমার এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। সেখানে ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই। এখানে তো ভয় আর ভয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে নির্ভয়। তোমাদের এই বাবা ওঁনার বাচ্চাদেরকে এমনই অপার সুখের দুনিয়ায় পৌঁছে দেন। সত্যযুগ যে অপার সুখের দুনিয়া। অপরদিকে কলিযুগ অপার দুঃখের দুনিয়া। তাই তো কলিযুগকে বলা হয় দুঃখধাম। বাবা তোমাদেরকে কোনও কষ্টই দেন না। ঘর - গৃহস্থ পরিবারে থেকেই লৌকিক বাচ্চাদের প্রতি কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। গুরু-গোঁসাইয়ের সংশ্রব ছাড়তে হবে। বাবা যে জাগতিক সব গুরুরও বড় গুরু। জাগতিক যা কিছু তা তো এই বাবারই রচনা। একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কারওকেই পতিত-পাবন বলা যায় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কি পতিত-পাবন বলা যাবে ? -অবশ্যই না। একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া দেবতাদেরও তা বলা যাবে না। বাচ্চারা, তবে কি গঙ্গাকে পতিত-পাবন বলা যাবে ? --এই জলের নদী তো সর্বদাই বহমান। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীরা তো বরাবরই প্রবাহমান। এইসব নদীর জলে লোকেরা তো কবে থেকেই স্নান করে আসছে। বর্ষাকালে নদীগুলিতে আবার বন্যার প্রকোপও হয়, যা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কি ভয়ংকর সেই দুঃখ। বন্যার কারণে কত মানুষও মারা যায়। সত্যযুগে এমন কোনও দুঃখের প্রশ্নই নেই। সেখানকার পশু-পাখিদেরও কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট হয় না। এদেরও অকাল মৃত্যু হয় না। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট যে এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে।

ভক্তি-মার্গে লোকেরা গেয়ে থাকে - বাবা, যখন তুমি আসবে আমরা তখন তোমারই হবো। বাবা অবশ্যই তখন আসেন, যখন এই দুঃখধামের অন্ত আর সুখধামের আদি - এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে। যা লোকরা জানেই না। এমনকি সৃষ্টি-চক্রের প্রকৃত আয়ু কত, তাও তারা জানে না। অথচ বাবা কত সহজ-সরল ভাবে তোমাদের তা বুঝিয়ে দেন। তোমরা বি.কে.-রা পূর্বে কি তা জানতে, সৃষ্টি-চক্রের মোট আয়ু ৫-হাজার বছর ? অথচ লোকেরা লক্ষ-লক্ষ বছর বলে থাকে। এখন বাবা তোমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন - প্রতিটা যুগের আয়ু ১২৫০-বছর করে। তাই তো সম্পূর্ণ স্বস্তিকা চিহ্নকে সমান চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি যুগই সমপরিমাণের। এই সমান অংশ, তোমাদের কাছেও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। জগন্নাথ পুরীতে ভাতের ভোগের জন্য যে হাঁড়ি চড়ানো হয়, সেখানেও চারটি সমপরিমাণ ভাগে ভাগ করে ভোগ বানানো হয়। সেখানকার লোকেদের ভাতই প্রধান খাদ্য। তা জগন্নাথই বলো কিম্বা শ্রীনাথই বলো- অর্থ কিন্তু একই। উভয়কেই কালো দেখানো হয়। শ্রীনাথের মন্দিরে শুদ্ধ ঘি-এর ভাণ্ডার রয়েছে। তাই সেখানকার ভাজা-ভাজি, খুব সুন্দর সুন্দর যাবতীয় ভোগের সামগ্রী, সবকিছুই শুদ্ধ ঘি-তেই তৈরি করা হয়। মন্দিরের বাইরের দোকানগুলোতেও আবার তা পাওয়া যায়। অনেক বড় পরিসরে সেই ভোগ উৎসর্গ করা হয়। যাত্রীরা দোকানদারের কাছ থেকে তা কিনেও নেয়। জগন্নাথ-পুরীতে চালের সামগ্রীই প্রধান। একজন জগন্নাথ অপরজন শ্রীনাথ। অর্থাৎ তা যেন সুখধাম আর দুঃখধাম। শ্রীনাথ হলো সুখধামের প্রতীক এবং অপরটি দুঃখধামের। বর্তমানের মানুষেরা কাম-বিকারের চিতায় বসতে বসতে এমন কলো হয়ে যায়। জগন্নাথের ওখানে কেবলমাত্র চালের সামগ্রীর ভোগ লাগানো হয়। অর্থাৎ এনাকে গরীব বোঝানো হয়েছে আর শ্রীনাথকে সম্পদশালী। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সাগর তো এই বাবা, কেবল একজনই। তেমনি ভক্তি-মার্গকে বলা

অজ্ঞান, তাই সেখান থেকে প্রাপ্তি কিছুই হয় না। যদিও অর্থকড়ি বেশ ভালই উপার্জন আর লাভও হয়, অবশ্য তা জমা হয় কেবল গুরুদের ঝোলাতেই। যারা চালাকচতুর তারা প্রশস্তি গাইবে গুরুর আর বলবে এই গুরুর থেকেই সে সবকিছু শিখেছে। এসবই জাগতিক ব্যাপার, যাদের জন্ম-কর্ম এমনই।

বাচ্চাদের কাছে এবার বাবা জানতে চাইছেন - বাচ্চারা, তোমাদের সামনে এখন কে বসে আছেন ? বিচিত্র এই বাবা। এই বাবার কোনও শরীর নেই। শরীর যা দেখছো তা দাদা ব্রহ্মার। যিনি পুরো ৮৪-জন্ম নিয়েছেন। এনার অনেক জন্মের পরে এটাই ওনার অন্তিম জন্ম, তাই এনার শরীরেই আমি অবস্থান করি। ফলে তোমাদেরকেও সুখধামে নিয়ে যেতে পারি। এই দাদাকে আবার 'গোমুখ'-ও বলা হয়। তীর্থস্থান গোমুখে কত দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসে। এখানেও আবার তেমন গোমুখ। গোমুখে পাহাড়ের ঝরনার জল তো বইবেই। কুয়োগুলিতেও প্রত্যহ যে জলের সঞ্চার হয়, তাও সেই পাহাড় থেকেই আসে। এই প্রবাহমান কখনো বন্ধ হয় না। সেই জলের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে সেখানে বইতেই থাকে। কিন্তু যেখানে-সেখানে নদী-নালার জলের ধারা বইতে দেখলেই লোকেরা তাকেও গঙ্গাজল বলে, সেখানে আবার স্নানও করে। কিন্তু গঙ্গাজলে কি আর পতিত থেকে পবিত্র হওয়া যায় ? এক এবং একমাত্র পতিত-পাবন তো এই বাবা, যিনি আত্মাদের বলেন- পবিত্র হবার জন্য লাগাতার কেবলমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করো। দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে নিজেকে আত্মা ভেবে কেবলমাত্র এই পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হবে। একমাত্র এই বাবাই যে তোমাদেরকে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ থেকে উদ্ধার করেন। এই সময়কালে তো দুনিয়ায় সবাই পাপ করে, যেহেতু তাদের কর্মভোগ ভুগতে হয়। কিন্তু এবার যদি আবারও পাপ করো, আগামীতে অবশ্যই তা ভুগতে হবে, তাও আবার ৬৩-জন্ম ধরে তার হিসেব-নিকেশ চলতে থাকবে, যখন থেকে তোমাদের গুণ-শক্তি আর কলার মান কম হতে থাকে। ঠিক যেমন ভাবে চন্দ্রের কলা হ্রাস হতে থাকে। কল্পের এই সময়কেই বলা হয় অসীমের দিন থেকে রাত। এখন তো সমগ্র দুনিয়াতেই বিশেষ করে ভারত ভূ-খণ্ডে রাহুর দশা চলছে। রাহুর দশায় আবার গ্রহণ লেগে আছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা এই সময়েই শ্যাম (কালো) থেকে সুন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছো। এই কারণেই কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। তাই তো চিত্রকারেরা কৃষ্ণকে কালো রং-এর আঁকে। যেহেতু লোকেরা কাম-বিকারের চিতায় বসে, তারই প্রতীক হিসাবে এমনটা করে। তবুও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এসবের সঙ্কেত বুঝতে পারে না। কেন কৃষ্ণকে কখনও কালো আবার কখনও উজ্বল গৌর-বর্ণের করে দেখায়। তোমরা বি.কে.-রা এখন সেই উজ্জ্বল গৌর-বর্ণের হবার জন্যই পুরুষার্থ করে চলেছো। সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করলে তবেই তো তেমনটা হতে পারবে। তা কিন্তু এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এই যে জ্ঞান এখন তোমরা ধারণ করছো, পরে তা প্রায় লোপ হয়ে যায়। যদিও পরে শাস্ত্র-গীতা পাঠ করে অন্যদেরকে শোনাতে পারবে, কিন্তু এই বিশেষ জ্ঞান শোনাতে পারবে না। তখন যা পারবে তা হলো ভক্তি-মার্গের শাস্ত্র জ্ঞান। ভক্তি-মার্গে তো এমন কতই না অনেক সামগ্রী থাকে, কত প্রকারের শাস্ত্র, যে যেমন ইচ্ছা লেখে, যেমন ইচ্ছা পড়ে, যেমন ইচ্ছা তেমনই প্রচার করে। লোকেরা রামের মন্দিরে যায়। রামকেও তারা কালো-রাম বানায়। এটা তো ভেবে দেখা উচিত, রামকে কালো কেন বানিয়েছে। যেমন কলকাতায় আছে, কালী কলকাত্তাবালী। তার সামনেই মা-মা বলে কত কাকুতি-মিনতি করে। সব থেকে কালো এবং ভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁকেই দেখানো হয়, অথচ তাঁকেই আবার 'মা' বলে সম্বোধন করে। অবশ্য তোমাদের তো জ্ঞান-বাণ, জ্ঞান-কাটারি এসব আছে। কিন্তু লোকেরা সেইসব অস্ত্র-শস্ত্রেই মাকে সাজায়। পূর্বে তো কালীর সামনে মানুষকেও বলি দেওয়া হতো। সরকার আইন করে তা বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্বে সিন্ধ প্রদেশে এই দেবীর কোনও মন্দির ছিল না। যখন সেখানে বোম্ বিস্ফোট হলো, কোনও এক ব্রাহ্মণ প্রচার করলো যে কালী তাকে আদেশ দিয়েছেন -"এখানে আমার কোনো মন্দির নেই, যত শীঘ্র সম্ভব এখানে আমার মন্দির তৈরি করো, অন্যথায় এমন আরও অনেক বোম্ বিস্ফোরণ হবে।" এর পরেই অনেক টাকা-কড়ির বন্দোবস্ত হলে, মন্দিরও তৈরি হলো। এখন সেখানে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছে। যার ফলে লোকেরাও দিশাহীন হয়ে মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরতে থাকে। এইসব কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন বাবা। বাবা কিন্তু কারও গ্লানি করেন না। তিনি কেবলমাত্র অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্যকে বোঝান। উনি ব্যাখ্যা করে বোঝান, এই সৃষ্টিচক্রে তৈরি হয়েছে কিভাবে। আজ অবধি তোমরা যা কিছু দেখেছো বা দেখেছা, আগামীতে পুনরায় আবারও ঠিক এমনটিই হবে এবং যেসব জিনিসপত্র এখনও তৈরি হয়নি, সেসবও তৈরি হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো সেই স্বর্গ-রাজ্য তোমাদেরই ছিলো, যা তোমরাই খুইয়েছো।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেদেরকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন তোমরা তো কত প্রকারের ধর্মীয় গল্প-গাঁথা শুনেছো, অমর-কথা শুনে কি তোমাদের কোনও পরিবর্তন হয়েছে ? তাতে কি কারও বুদ্ধির ত্রিনয়ন উন্মোচিত হয়েছে ? --না ! তাই বাবা স্বয়ং এখন সামনে বসে সেই কথার যথার্থ অর্থ বোঝাচ্ছেন বি.কে.-দেরকে। এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা কোনও অসভ্য কিছু দেখবে না মোটেই। দৃষ্টি-কোণ যেন

সুসভ্য হয়, বিন্দুমাত্রও অসভ্যতা যেন না আসে মনে। এই পুরোনো দুনিয়ার কোনও কিছুই লক্ষ্য করবে না, এ সবকিছুই তো অচিরেই বিনাশ হবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - বাচ্চারা, "আমি তো তোমাদেরকে আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী করে দিয়ে যাচ্ছি। যেখানে তোমরা ছাড়া আর কেউই সেই স্বর্গ-রাজ্যে আসবে না। যেখানে দুঃখ-কষ্টের নামগন্ধও থাকে না। ধন-সম্পদশালী হয়ে তোমরা খুবই সুখে রাজত্ব করো। অথচ, এখানে এই দুনিয়ায় কত লোক অনাহারে মারা যায়। কিন্তু সত্যযুগে অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে একমাত্র তোমরাই সমগ্র দুনিয়ায় রাজত্ব করো। ফলে খুব কমই জমিজমা ব্যাবহারে লাগে তোমাদের। সেই ছোট বাগানই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে কলিযুগের অন্তিমে কত বড় আকারের হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে আবার ৫-বিকারের প্রবেশের কারণে যা ক্রমে কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়। তাই বাবা জানাচ্ছেন - কাম-বিকারই মহাশত্রু, যার কারণে আদি-মধ্য-অন্ত তোমরা এত দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকো। এই জ্ঞান ও ভক্তির ব্যাপারটাও এখন তোমরা যথাযথ জেনেছো। বিনাশ যে এখন দোরগোড়ায়। অতএব খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করতে হবে। তা না হলে পাপের বোঝা ভষ্ম হবে না যে। একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করলেই সেই পাপের কালিমা ভষ্ম হয়। যেহেতু পতিত-পাবন বাবা যে একজনই। কল্প পূর্বে যারা তেমন পুরুষার্থ করেছিল, এবারও তারা তেমনটি করবে। অতএব আর অপেক্ষা কোরো না। এক ও একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া আর কারওকে স্মরণে আনবে না। অন্যেরা সবাই তো দুঃখের কারণ। যিনি সদাকালের সুখের ব্যাবস্থা করেন, কেবলমাত্র ওঁনাকেই স্মরণে রাখবে। এতে কিন্তু ঢিলেমি করবে না মোটেই। স্মরণে যোগযুক্ত হয়ে না থাকলে পবিত্র হবেই বা কি প্রকারে ? *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা 'ইভিল' (অসভ্য) কিছুই দেখবে না। বাবা স্বয়ং ত্রিনেত্র উন্মোচনের যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই 'সিভিল' (সুসভ্য) দৃষ্টি-কোণ থেকেই সবকিছু দেখতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থী হতে হবে।

২) ঘর গৃহস্থ সামলাবার সাথে সাথে অতি প্রিয় বাবার সাথে লাগাতার স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হতে হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে যেন স্থিত হয় যে, অন্তিমকালে একমাত্র বাবা ছাড়া আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে।

বরদানঃ- অ্যাটেনশান (মনোযোগ) আর চেকিং-এর দ্বারা স্ব-সেবা করে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ ভব*

ব্যাখ্যা :- স্ব-এর সেবা অর্থাৎ স্ব-কে সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ কবার অ্যাটেনশানে সদা নিজেকে রাখতে হবে। পঠন-পাঠনের মুখ্য বিষয়গুলিতে নিজেকে 'পাশ উইথ অনার' বানাতে হবে। জ্ঞান-স্বরূপ, যোগ-স্বরূপ এবং ধারণা-স্বরূপ হয়ে, এই স্ব-সেবাগুলি সদা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারলে, তবেই সেই সেবা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজের সম্পন্ন স্বরূপ দ্বারা অনেকেরই সেবা হতে থাকবে। কিন্তু সেই সেবার বিধি হলো- 'অ্যাটেনশান' আর 'চেকিং'! চেকিং কেবল নিজের প্রতি, অন্যকে নয়।

স্লোগানঃ- অতি বাক্য ব্যয়ে মনন শক্তি হ্রাস পায়, অতএব স্বল্পভাষী হয়ে মধুর বাক্য বলবে ।*

. !! ওঁম্ শান্তি !!